বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ এপ্রিল ২০১৬

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সামাজিক ন্যায়বিচার আবশ্যক—চা শ্রমিকের অধিকার বিষয়ক নাগরিক সংলাপে বক্তারা

জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী শোভাযাত্রা

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, তথ্যচিত্রের প্রথম প্রদর্শনী এবং আলোচনা

তথ্যচিত্র মাটির মায়া'র প্রথম প্রদর্শনী ও আলোচনা

জোড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনী—ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচয় এবং প্রান্তিকতা

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদ্‌যাপন

প্রকল্পের সমাপ্তি

অন দি মার্জিনস্—ইমেজেস্ অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস

মাটির মায়া—বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী বিরোধ ও সংঘর্ষের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
কাজী মনজিলা সুলতানা, গৌতম বসাক ও সামান্থা শাহ্‌রিণ

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে সেড পরিচালিত "বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায়। পার্টনার: গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)। সহযোগী সংগঠন: জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাগানিয়া এবং মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৫ম তলা), মিরপুর, ঢাকা-১২১৬,
ফোন:+৮৮০-২-৯০২৬৬৩৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সামাজিক ন্যায়বিচার আবশ্যক

—চা শ্রমিকের অধিকার বিষয়ক নাগরিক সংলাপে বক্তারা

সংলাপে অংশগ্রহণকারীগণ। ছবি: এহসানুল হক চৌধুরি

বাংলাদেশের চা শ্রমিকের দুর্দশার কথা আমরা খুব কমই জানি এবং আলোচনা করি। আমাদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যে চা তার শিল্পোৎপাদন এবং অবকাঠামো তৈরিতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের নিয়ে আমরা কতটুকুই বা চিন্তা করি। সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম জেলাসমূহের চা বাগানে যাদের বসবাস তারা কদাচিৎ আমাদের চিন্তায় আসে। চা বাগানের নয়নাভিরাম পরিবেশ উপভোগের সময় রঙিন কাপড়ে বিরাট ঝুড়ি কাঁধে জরাজীর্ণ শরীরের ঐ নারীরা হয়তো আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু পলকেই তারা আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায়, আমরা তাদের বিষয়ে নির্লিপ্ত আর অজ্ঞই রয়ে যাই।

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৬ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো-কোঅপারেশন-এর অর্থায়নে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) একটি নাগরিক সংলাপ আয়োজন করে, যার শিরোনাম ছিল 'চা শ্রমিক ও তাদের জাতিসত্তার পরিচয়, মানচিত্র ও অধিকার বিষয়ে পুনর্ভাবনা'। অনুষ্ঠানে চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন- চা শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শ্রম অধিকারকর্মী এবং সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিক সংলাপটি পরিচালিত হয় পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এর সঞ্চালনায়। নির্ধারিত আলোচকের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি তপন দত্ত; শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার-এর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিচালক মো: আজিজুল ইসলাম; বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ)-এর শ্রম, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য শাহ খাইরুল এনাম; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এর সহকারী নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর পরিচালক এবং প্রধান গবেষক ফিলিপ গাইন বাংলাদেশের

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

চা শ্রমিকদের মানচিত্র, পরিচয় ও রাজনৈতিক এজেন্ডা বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল উপস্থাপন করেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ-মহাপরিদর্শক মো: আজিজুল ইসলাম বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে চা শ্রমিকরা যে বৈষম্যের সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন (ধারা ২৩৪) অনুযায়ী একটি ব্যবসায়িক সংগঠনের এক বছরের নীট মুনাফার ৫% শ্রমিকদের যৌথ সিদ্ধান্ত মতে শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল বা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রদান করতে হবে। কিন্তু চা শ্রমিকরা মুনাফার এই অংশ পান না। চা সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি এই আইনগত অসামঞ্জস্যতার উপর জোর দেন।

চা জনগোষ্ঠীর দুর্দশার সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে, যখন তারা প্রতারণার শিকার হয়ে বাংলার এই চা বাগানগুলোর দিকে যাত্রা শুরু করে। এক হিসাব অনুযায়ী প্রথম বছরগুলোতেই প্রায় একতৃতীয়াংশ চা শ্রমিক যাত্রাপথের প্রতিকূলতায় টিকে থাকতে না পেরে মারা যান। যারা শেষ পর্যন্ত চা বাগানগুলোতে পৌঁছাতে সক্ষম হন তারা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকে পরিণত হন এবং চা বাগান মালিকদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে যান। তখন থেকেই লেবার লাইনগুলোতে তারা আবদ্ধ এবং এখনও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতিগতভাবে আশেপাশের সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন।

এদেশে কম মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মধ্যে চা শ্রমিকরা অন্যতম। 'ক' শ্রেণির বাগানে কাজ করার জন্য তারা দৈনিক ৮৫ টাকা, 'খ' শ্রেণীর বাগানের জন্য ৮৩ টাকা এবং 'গ' শ্রেণীর বাগানের জন্য ৮২ টাকা মজুরি পান। অশোভন ও কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার ফলে তাদের একইসঙ্গে ক্লান্তি ও ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। কাজের সময় তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পানিও সরবরাহ করা হয় না, এমনকি অস্বাস্থ্যকর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য অনেক সময় খাবার পানিও দূষিত থাকে। চা শ্রমিকদের বিষাক্ত কীটনাশকের খুব কাছে থেকে কাজ করতে হয় কিন্তু এ জন্য প্রয়োজনীয় আত্মরক্ষার সামগ্রী তাদের দেয়া হয় না। এসব কারণে চা শ্রমিকদের চর্মরোগ, ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা লেগেই থাকে।

হবিগঞ্জের চান্দপুর চা বাগানের ৫১১ একর কৃষিজমিকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিণত করতে সরকারের সাম্প্রতিক পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তারা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনার জের ধরেই গত এপ্রিল, ২০১৫ থেকে বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। কৃষিজমির অধিকার রক্ষায় সোচ্চার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন কয়েক হাজার শ্রমিক যারা দেড়শ বছরের পুরনো এ ফসলি জমিতে বংশ পরম্পরায় ফসল ফলাচ্ছেন।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বিশেষভাবে নিগৃহীত এসব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষাখাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোকপাত করেন।

চা শ্রমিকদের তাদের অধিকারের প্রতি সচেতন করে গড়ে তোলা এবং শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করার কথা বলেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরী। চা শ্রমিক এবং সেড- এর গবেষণা সহকারী আশা অরনাল চা বাগানে জীবনযাপনের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, "৮৫ টাকার দিন মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিক কীভাবে একই সাথে তার পরিবার চালাবে আবার তিন বেলা খাবারের যোগান দিবে, এটা অসম্ভব।" তিনি বিশেষভাবে চা বাগানের লিঙ্গ বৈষম্যের দিকটি তুলে ধরেন। "নারীরাই চা শিল্প চালায়, আমাদের ছাড়া এই শিল্প হয়ত টিকতনা, তবুও আমরা যথাযথ পয়:নিষ্কাশনব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি বা স্বাস্থ্যসেবা পাই না।"

চা শ্রমিকদের মধ্যে অর্ধেকই নারী। তবুও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে তাদের দেখা যায় না। তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন যেমন- ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা, দীর্ঘ কর্মঘন্টা, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে অনিয়ম ইত্যাদি। চা শ্রমিকরা রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত একটি সম্প্রদায়। তারা বেঁচে থাকে বাগান মালিকদের করুণায় এবং বঞ্চনাপূর্ণ জীবন নিয়ে যেখানে রাষ্ট্রই তাদের শোষণ করে। বহু বছর আগে এখানে বসতি স্থাপন করলেও সংস্কৃতি, জাতিসত্তা ও ধর্ম ভিন্ন থাকায় সাধারণ বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের বহিরাগতের মত দেখে; নিজেদের ভূমিতেই তারা কোনো অধিকার পায় না। চা বাগানের বাইরে শিক্ষা বা কর্মসংস্থান পাওয়ার তেমন সুযোগ তাদের নেই। আর তাই পরিস্থিতি উন্নত হবার আশাও খুব ক্ষীণ। তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন। যদিও চা শ্রমিকদের মত অন্যান্য সম্প্রদায় রক্ষায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনে চুক্তিবদ্ধ তবুও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম। তাদের দুর্দশাই আমাদের রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে। আর তাই সুগন্ধ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে চা যখন প্রস্তুত তখন পরের কাপ চা-এর সাথে অনেক কিছুই উপলব্ধি করার আছে যা আমাদের চিন্তার খোরাক জোগাবে। ❑ আসফারা আহমেদ

জাতীয় সম্মেলন

জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী শোভাযাত্রা

১৭ এপ্রিল ২০১৬, উৎসব মুখর একটি মিছিল নেচে গেয়ে ঢাকার রাজপথ অতিক্রম করে। আসাদ এভিনিউ থেকে মানিকমিয়া এভিনিউ'র দিকে যেতেই তাদের হেডব্যান্ডে চোখে পড়ে দৃঢ় দাবি "আমাদের পরিচয় আমাদের সংস্কৃতি"। বক্তব্য স্পষ্ট, "আমরা এখানে। আমাদের দেখো। আমাদের গ্রহণ করো। আমাদের সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করো।" এই মিছিলটি "চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার পরিচয়, মানচিত্র ও অধিকার বিষয়ে পুনর্ভাবনা" শিরোনামের জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনের বার্তা বহন করে যা গত ১৭ ও ১৮ এপ্রিল, ২০১৬-তে ঢাকার সিবিসিবি সেন্টার এবং দৃক গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়।

র‍্যালীতে ঢোল বাজাচ্ছেন একজন চা শ্রমিক। ছবি: ফিলিপ গাইন

সম্মেলনটির লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তা বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং তাদের অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সংরক্ষণে আলোচনা করা। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে নিজেদের সংস্কৃতি সানন্দে ও সগৌরবে দর্শকদের কাছে তুলে ধরে। এতে ঐতিহ্যবাহী দাশাই (স্বাগতম) নৃত্যের সাথে শব্দকর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্যাক্সোফোন এবং সান্তালরা ঢোল ও করতাল বাজায়। মিছিলে অনেকের মাঝে অংশগ্রহণ করেন সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান এবং ভূমি অধিকার কর্মী ও আদিবাসী নেত্রী বিচিত্রা তিরকি। জাতীয় সম্মেলনটির পরিসমাপ্তি ঘটে ১৮ এপ্রিল ২০১৬-তে একটি প্রাঞ্জল সাংস্কৃতিক উৎসবের মধ্য দিয়ে যা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও স্বল্প-পরিচিত সম্প্রদায়গুলোর বৈচিত্র্য এবং স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটায়। ❑

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং আলোচনা

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। ছবি: এহসানুল হক চৌধুরি

"চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, ভৌগলিক অবস্থান এবং অধিকার বিষয়ে পুনর্ভাবনা" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের অংশ হিসেবে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ১৮ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকার সিবিসিবি সেন্টারে আলোকচিত্রের বই "অন দি মার্জিনস্: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস"-এর মোড়ক উন্মোচন ও প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে।

সেড এর সভাপতি অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খানের সভাপতিত্বে আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস্ বাংলাদেশ-এর এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিদ মৌসুমি শবনম এবং ইকো কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম অফিসার হাসনাহেনা খান। বক্তারা চা শ্রমিক ও আদিবাসীদের ছবি সংবলিত বই এবং তাদের উপর করা গবেষণায় যে তথ্য উঠে এসেছে সে বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।

সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইন তার সূচনা বক্তব্যে চা বাগান ও সমতল ভূমিতে বসবাসরত স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের উপর গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (দি স্মল এথনিক গ্রুপস্ কালচারাল ইন্সটিটিউশন অ্যাক্ট ২০১০)-এ বাংলাদেশে ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর তালিকা দেয়া আছে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মারমা এবং মং একই জাতিগোষ্ঠী এবং ত্রিপুরা ও উসুই বা উসাইরাও একই। আবার সমতলভূমির মালপাহাড়ি ও পাহাড়িরাও একই জাতিগোষ্ঠী। ফলে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি ও ২০১০ সালের নতুন আইন অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫।

আদিবাসীদের কিছু সংগঠনের মতে তাদের সংখ্যা ৪৫ বা তার কিছু বেশি। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানচিত্রায়ণ থেকে ফিলিপ গাইনের উপস্থাপিত তথ্য মিডিয়া, গবেষণাকর্মী ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি বেঞ্চমার্ক তৈরি করে। সরকারি নথিতে উল্লিখিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বাইরে সেড উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-মধ্যাঞ্চলে ৩৭টি জাতিগোষ্ঠী খুঁজে পেয়েছে যার মধ্যে কিছু জাতিগোষ্ঠী চা বাগানেও আছে। চা বাগানগুলোতে বসবাসরত জাতিগোষ্ঠীগুলোর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে। চা শ্রমিক (১২২,০০০) ও তাদের জাতিগোষ্ঠীগুলোর (প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ) মধ্যে অনন্য বিষয়টি হল এরা বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ পরিচয় বহন করে—যার সংখ্যা অন্তত ৮০। ১৫৬টি চা বাগানে (বাংলাদেশ টি বোর্ডের প্রতিবেদন 'স্ট্যাটিসটিকস্ অন বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রি-২০১৫'তে ১৬০টি চা বাগানের তালিকা দেয়া হয়েছে; যদিও তার মধ্যে তিন-চারটি এখন বন্ধ রয়েছে এবং সেখানে কোনো জাতিগোষ্ঠীর বসবাস নেই। এই বাগানগুলোতে সেড কোন এফজিডি করেনি), খুঁজে পাওয়া ৮০টি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র নয়টির নাম সরকারি দলিলে আছে।

ফিলিপ গাইন জানান, "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ), উত্তর-মধ্যাঞ্চল, পটুয়াখালি ও কক্সবাজারের উপকূলীয় অঞ্চল এবং চা বাগানগুলো মিলিয়ে আমরা মোট ১১০টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী খুঁজে পাই।"

চা বাগানের ৮০টি জাতিগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ছবি সংবলিত ২৩২ পৃষ্ঠার ফটো অ্যালবাম *অন দি মার্জিনস্: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস*-এর মোড়ক উন্মোচনের পর ফিলিপ গাইন তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ফটো অ্যালবামটিতে জাতিসত্তার মানুষের মুখের ছবির পাশাপাশি তাদের জীবনযাপনের অন্যান্য অনুষঙ্গও স্থান পেয়েছে। ফটো অ্যালবামের প্রধান আলোকচিত্রী ফিলিপ গাইন জানান এ সংক্রান্ত আরো দুইটি বই এখনো প্রকাশের অপেক্ষায় আছে যেখানে বাংলাদেশের আদিবাসীদের পুরো চিত্রটি পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে বসবাসরত স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তা ও চা শ্রমিকদের পরিসংখ্যানগতভাবে দৃশ্যমান করে তোলা ও রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন আলোচনার অন্যতম মূল বক্তা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। "বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিয়ে ফটো অ্যালবামটিতে উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ তথ্য এ সংক্রান্ত

গবেষণা ও লেখালেখিতে একটি অনন্য সংযোজন যা তাদের দৃশ্যমানতার বিষয়টিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই অদৃশ্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর স্বীকৃতি আদায়ে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি।" বলেন ড. রহমান।

এই মানচিত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের সরাসরি অংশগ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ড. তানজিমুদ্দিন বলেন, "অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কাজ করা যেকোনা গবেষণাকে অর্থবহ করে তোলে। এই মানচিত্রায়ণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদেরকে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা ও পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।"

মৌসুমি শবনম বলেন, "যে তথ্য আজকে এখানে উপস্থাপন করা হল তা আমাদের বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসত্তাগুলোকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নৃতাত্ত্বিক ও গবেষকদের স্বল্প-পরিচিত জাতিগাষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের নিয়ে আরো গবেষণা করতে আগ্রহী করে তুলবে।"

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, "বাংলাদেশে বাঙালি বাদেও এতগুলো জাতিসত্তার বসবাস জেনে আমরা বিস্মিত। বাংলাদেশের এই জাতিগোষ্ঠী নিয়ে আরো গবেষণা হলে বিস্ময়কর তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।" এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর পরিচয়, ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হুমকির মুখে বলে সতর্ক করে দেন তিনি। এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা এমনকি অনেক জাতিও হারিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে এইসব মানুষ, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান তিনি। ❑

তথ্যচিত্র মাটির মায়া'র প্রথম প্রদর্শনী ও আলোচনা

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং চা বাগানের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভূমি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ৩০ মিনিটের তথ্যচিত্র *মাটির মায়া*'র উদ্বোধনী প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। আদিবাসীদের ভূমি বিরোধ নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র মাটির মায়া। যেসব আদিবাসীরা একসময় ভূমির মালিক ছিল তাদের অধিকাংশই এখন ভূমিহীন ও নিঃস্ব। তারা এখন অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গের ৮০ ভাগ আদিবাসীই ভূমিহীন।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু আইন রয়েছে। তবে, আদিবাসী ও অন্যান্যদের অভিযোগ এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। রাষ্ট্র আদিবাসীদের পক্ষ নেয় না—এধরনের অভিযোগ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন স্বীকার করে না। প্রশাসনের অনেকেই অভিযোগ করেন যে আদিবাসীরা তাদের জমির কাগজপত্র ঠিকঠাক রাখেন না।

তথ্যচিত্রটি একদিকে ভূমি ও ভূমি নিয়ে বিবাদের যেমন বর্ণনা দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে ভূমিসংক্রান্ত কাগজপত্র ও বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও এ বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের পরামর্শ তুলে ধরেছে।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেনের সভাপতিত্বে ও ফিলিপ গাইনের সঞ্চালনায় তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনীর পর এর উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতা, সমালোচক, আইনজীবী, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং এ বিষয়ে পরামর্শ দেন।

এ ধরনের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মাঞ্জারে হাসিন মুরাদ। তথ্যচিত্রটি নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, "যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো নিয়ে টেলিভিশন চ্যানেল বা উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রচারে আগ্রহ দেখায় না সেখানে ভূমি বিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে এ ধরনের তথ্যচিত্র নির্মাণ বিরল। এরকম একটি জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রযোজক ও পরিচালক যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এটা মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের চোখ খুলে দিবে।"

বাংলাদেশের আদিবাসীদের আইনি সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (এএলআরডি) নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। তিনি বলেন, "আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় আমাদের নির্দিষ্ট আইন করা দরকার।"

ভূমির উপর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিজের জমি ফেরত পেতে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের কথা বর্ণনা করেন বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিলিমন বাস্কে, ভূমি বিরোধের জেরে শারীরিক নির্যাতনের শিকার রাজশাহীর ওরাওঁ নারী বিচিত্রা তিরকি এবং জয়পুরহাটে কর্মরত আদিবাসী আইনজীবী বাবুল রবিদাস।

আলোচনার বিশেষ অতিথি ও রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীদের নিয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন, "রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তাদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আদিবাসীদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" ❑

জোড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের পরিচয় এবং প্রান্তিকতা

জোড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে আগত কয়েকজন দর্শনার্থী। ছবি: ফিলিপ গাইন

"বাঙালি জাতির পরিচয় ও সংস্কৃতির আধিপত্যই আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার মূল কারণ", ফিলিপ গাইন ও অন্যান্যদের তোলা ছবি নিয়ে পাঁচদিনব্যাপী (১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬) জোড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনী 'অন দি মার্জিনস: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনটিস'-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ১৭ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকার দৃক গ্যালারীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ রেহনুমা আহমেদ।

প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রান্তিকতা ও অদৃশ্যমানতার উপর আলোকপাত করে তিনি বলেন যে, নৃতত্ত্ববিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে, সংখ্যালঘুদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় হিসাবে। কিন্তু এখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও সময় এসেছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের অবতারণা করেন তিনি, "কেন এই জাতি আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না?"; "কেন রাষ্ট্র তাদের মৌলিক অধিকার দিতে চায় না?"; "কেন সংবিধানে রাষ্ট্রের সব নাগরিককে বাঙালি বলা হয়?" বাঙালি পরিচয়টা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে আদিবাসীদের উপর চেপে বসেছে বলে অভিযোগ করেন এই নৃতত্ত্ববিদ। তিনি আরো বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা যতদিন পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ না করবে ততদিন এই পরিস্থিতির কোন উন্নতি হবে না।"

বাংলাদেশের আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠীগুলোর ঐতিহ্যবাহী নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শনী শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্যে প্রদর্শনীর প্রধান আলোকচিত্রী ফিলিপ গাইন প্রদর্শিত ছবিগুলোর পেছনের গল্প তুলে ধরেন, যেখানে প্রকাশ করা হয়েছে চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের জীবন, জীবিকা, সংগ্রাম, কাজের পরিবেশ ও সংস্কৃতি।

বাংলাদেশে, বিশেষ করে চা বাগানগুলোতে যে বেশ কিছু অপরিচিত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছে তা বোঝা গিয়েছিল ২০১২ ও ২০১৩ সালে সেড আয়োজিত কয়েকটি কর্মশালার আলোচনা থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কো-অপারেশনের অর্থায়নে "বাংলাদেশের চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পে এই অপরিচিত জাতিসত্তাগুলোর উপর অনুসন্ধান করতে সেড "এমিক" (নিচ থেকে উপর) পদ্ধতি অনুসরণ করে।

বাংলাদেশের চা বাগানগুলো, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলা এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৯টি জেলায় এফজিডি ও মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানে এই জাতিগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাতিসত্তার প্রতিনিধিত্বকারী মাঠ গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আলোকচিত্র ছিল মানচিত্রায়ণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

"বাঙালি জাতির পরিচয় ও সংস্কৃতির আধিপত্যই আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকতার মূল কারণ।"

প্রদর্শনীর বেশিরভাগ ছবিই প্রকল্প ও গবেষণা কাজের তিন বছরের মধ্যে তোলা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের সরকারি নথিতে মাত্র ২৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেডের গবেষণায় সেখানে চা বাগানেই ৮০টি (যার মধ্যে ৭০টির নাম সরকারি দলিলে নেই) এবং অন্যান্য এলাকায় ৩৭টি ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া গেছে। ফিলিপ গাইন আশা প্রকাশ করেন যে সেডের এই গবেষণার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতো সংস্থাগুলোর নজরে আসবে যেন এইসব জাতিগোষ্ঠীরা তাদের স্বীকৃতি পায় এবং জাতীয় আদমশুমারিতে সঠিকভাবে তাদের উপস্থাপন করা হয়।

২০১১ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী পাশ করা হয় যেখানে বলা হয়েছে "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হইবেন।" এই সংশোধনীতে আদিবাসীদের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এটি তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সাহায্য করতে যে ধরনের স্বীকৃতি প্রয়োজন ছিল তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত আলোকচিত্রী ড. শহীদুল আলম এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর অদৃশ্যমানতা ও বিলুপ্তির বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, "১৯৫২ সালে আমরা আমাদের ভাষার জন্য লড়াই করেছি। তাহলে এই আমরাই কেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষা কেড়ে নিতে চাই?" তিনি একই সঙ্গে ছবির শক্তি এবং কখন, কোথায় দাঁড়িয়ে কার ছবি তোলা হয় এবং তা কীভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে বলে উল্লেখ করেন। আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষের অবস্থান বিবেচনা করে তোলা প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত ছবিগুলোর প্রশংসা করেন এই আলোকচিত্রী।

দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি চিত্ত ঘোষ, মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট-এর পরিচালক পরিমল সিং বাড়াইক,

উওমেন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ-এর পরিচালক সন্ধ্যা মালো আদিবাসী মানুষের অদৃশ্যমানতা ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের জাতিবৈচিত্র্য এবং বহুমুখী সমাজকে সম্মানের সাথে মেনে নিতে আহ্বান জানান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক গোলাম রহমান। তিনি বলেন, "বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও জাতিসত্তা আমাদের রাষ্ট্রের বাস্তবতা। এটাকে কোনোভাবেই পাশ কাটানো যাবে না। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে নয়, বরং সাথে নিয়েই ঐক্য সম্ভব, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে।"

সবশেষে জোড়া আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করেন জিবিকে'র প্রধান নির্বাহী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, "এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে এত ছোট দেশে এতগুলো জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। সারা বিশ্বের কাছে এই বৈচিত্র্য উপস্থাপন করতে আমাদের কাজ করা উচিত।"

যেসব জাতিগোষ্ঠীর প্রতিকৃতি, জীবন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক জীবনধারা প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে: বম, চাকমা, চাক, খুমি, খিয়াং, লুসাই, মারমা, ম্রো, পাংখো/পাংখোয়া, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, রাখাইন, অলমিক, বাকতি, বানাই, বাঙালি, বাড়াইক, বর্মা, বাশফোঁর, বাউরি, বীন, ভর, ভোক্তা, ভূঁইমালী, ভূঁইয়া, ভূমিজ, বিহারী, বিন্দুমণ্ডল, বুনো, বুনার্জি, চাষা, ছত্রি, চৌহান, ডালু, দুসাদ, গঞ্জু সিং, গারো, ঘাটুয়াল, গিরি, গোয়ালা, গড়াইত, গোস্বামী, গৌর, গয়াসুর (অসুর), হাজং, হাজরা, হাড়ি, হদি, ঝরা, কাদর, কাহার, কৈরী, কালিন্দী, কালোয়ার, কানু, কর্মকার, কেওট, খাড়িয়া, খাসি, খোদাল, কোচ, কোডা, কোল, কন্দ, কোরা, কুমার (পাল), কুর্মী, লোহার, লিঙ্গাম, মান্দ্রাজি, মাহলে, মাহাতো, মাঝি, মাল, মালো, মোদক, মণিপুরী, মৃধা, মুন্ডা, মুশোহর, নাইডু, নায়েক, নেপালি, নুনিয়া, ওঁরাও, পাহড়িয়া, পণ্ডিত, পাইনকা, পাশি, পাত্র, ফুলমালি, প্রধান, রাজবল্লভ, রাজভর, রাজবংশী, রাজগর, রাজওয়ার, রাউতিয়া, রেলি, রবিদাস, সাধু, সান্তাল, শবর, শীল, শুক্লাবৈদ্য, শব্দকর, তাঁতি, তেলি (পাল), তংলা ও তুরি। ❑ আসফারা আহমেদ ও সাবরিনা মিতি গাইন

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদ্‌যাপন

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সান্তাল দলের পরিবেশনা। ছবি: ফিলিপ গাইন

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বেশিরভাগ বাঙালি হলেও এদেশে বাঙালি ও বাংলা ছাড়াও আছে বিভিন্ন জাতিসত্তা, ভাষা আর সংস্কৃতি। এই ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করেছে। তবে এই সংস্কৃতিগুলোর অনেক বিষয়ই এখনও আমাদের অজানা।

"বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, মানচিত্র ও অধিকার বিষয়ে পুনর্ভাবনা" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ১৮ এপ্রিল ২০১৬ "আমাদের পরিচয় আমাদের সংস্কৃতি" শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়, যা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু এই অবহেলিত ও বিস্মৃত জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

এই সান্ধ্যকালীন আয়োজনটি চা শ্রমিক ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের খানিকটা স্বাদ এনে দেয়।

অনুষ্ঠানে সান্তাল, মাহলে, গারো ও কোচ শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন; তেলেগু শিল্পীরা নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার। এছাড়াও তাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছুটা চিত্র তুলে আনতে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প যেমন-ঝুড়ি, শিকার ও চাষকাজের উপকরণ, অলংকারসহ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত নানা সামগ্রীর প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মননশীল সাহিত্যিক ড. রফিকুল ইসলাম, এমিরিটাস অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এবং দেশের বিশিষ্ট অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ আদিবাসীদের পরিচয়, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। তাঁরা বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মামুনুর রশীদ আমাদের জীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ''আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে কেননা সংস্কৃতিই আমাদের পরিচয়। এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি আমরা কারা।'' একটি সমাজের ভিত মজবুত করতে এ ধরনের বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন এই শিক্ষাবিদ। ড. রফিকুল ইসলাম আদিবাসী ভাষাগুলোর পাশাপাশি নিজেদের জাতীয় ভাষাকেও বাঁচিয়ে রাখার গুরুত্ব প্রকাশ করেন। ❑

এদেশে রয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তা, ভাষা আর সংস্কৃতি। এই ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রকল্পের সমাপ্তি

লেবার লাইনে গবেষণা কাজে নিমগ্ন প্রকল্পের মাঠ গবেষক আশা অরনাল।

"বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহের মানচিত্রায়ণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পটি শুরু হয় ২০১৩ সালের ১ মে এবং শেষ হয় ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল। তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি ছিল বাংলাদেশে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহকে তুলে ধরবার এক অনন্য উদ্যোগ। চূড়ান্ত উপকারভোগী ও ঈপ্সিত জনগোষ্ঠীকে মানচিত্রায়ণের সাথে সম্পৃক্ত করা, তাদের বিষয়গুলোকে উত্থাপন করা, মানবাধিকারের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, অ্যাডভোকেসির কাজে তাদের অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজগুলো খুব সার্থকতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে যেমনটি এই প্রকল্পের শুরুতে আশা করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের বৃহত্তর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিসরে চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং চা শ্রমিকদের বন্দীদশা। এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ভালোভাবেই।

এই প্রকল্পে ৮০ ভাগ অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং সম্পূরক ২০ ভাগ অর্থায়ন করেছে নেদারল্যান্ডসের দাতা সংস্থা ইকো কোঅপারেশন। প্রকল্পের পার্টনার ছিল গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) এবং তিন সহযোগী সংগঠন ছিল মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট (এমসিজেএএফ), বাগানিয়া এবং জাতীয় আদিবাসী পরিষদ (জেএপি)। প্রথম দুই সহযোগী সংগঠন চা বাগানের এবং তৃতীয় সহযোগী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তিনটি সংলাপের একটি বাদে পরিকল্পিত সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। একটি সংলাপের পরিবর্তে সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা সম্পন্ন করা হয়। তবে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত উইলিয়াম হানা-এর শ্রীমঙ্গল সফর ছিল তার জন্য মাঠ পর্যায়ে এই প্রকল্পের কাজ বোঝা এবং চূড়ান্ত উপকারভোগী এবং ঈপ্সিত জনগোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। তার এই সফর সকল টার্গেট গ্রুপের মধ্যে একটি সংলাপের সুযোগ করে দেয়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চূড়ান্ত উপকারভোগী চা জনগোষ্ঠী এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর মানচিত্রায়ণ যা খুব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অনুসন্ধানের ফলাফল অনুযায়ী সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং রাঙ্গামাটি জেলার ১৫৬টি চা বাগানে ৮০টি জাতিগোষ্ঠী পাওয়া গেছে। ১৯৯১ সালের সরকারি আদমশুমারি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০-এ এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাত্র নয়টির উল্লেখ আছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসাবে। উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাগুলোর মানচিত্রায়ণের ফলে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে এ অঞ্চলে চা বাগান এবং সরকারি তালিকার বাইরে ৩৭টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী আছে। এই জাতিসত্তাগুলো 'অবহেলিত' বা অদৃশ্য। মানচিত্রায়ণ, ইনভেন্টরি, জরিপ, এবং অনুসন্ধানে চূড়ান্ত উপকারভোগী ও ঈপ্সিত গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ মানচিত্রায়ণ অনুশীলনের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন এইসব জাতিসত্তার প্রোফাইল, তাদের ভৌগোলিক মানচিত্র, এবং বঞ্চনা ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ তিনটি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এসব হাতে নিয়ে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার জন্য ক্যাম্পেন ও শিক্ষামূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক সবগুলো প্রশিক্ষণ কর্মশালা—যুবক, কমিউনিটি নেতা এবং মানবাধিকার কর্মীদের জন্য দুটি; উপকারভোগীদের সংগঠনগুলোর জন্য একটি; চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের জন্য একটি এবং মানবাধিকারকর্মী এবং চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত নেতাদের জন্য একটি—সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সকল নির্ধারিত প্রকাশনা এবং ভিজিবিলিটি উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশনাগুলো হলো প্রজেক্ট ফ্লায়ার, ব্রোশিওর, নিউজ লেটার: প্রান্তজন-এর তিন সংখ্যা, তিন বছরের ক্যালেন্ডার, ছবির এ্যালবাম—অন দি মার্জিনস্: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস, চা শ্রমিক ও তাদের জনগোষ্ঠীর ওপর বই—"স্লেভস ইন দিজ টাইম: টি কমিউনিটিস ইন বাংলাদেশ," স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাগুলোর উপর বই—"লোয়ার ডেপথস: লিটল-নোন এথনিক কমিউনিটিস অব বাংলাদেশ," প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পাঁচটি পোস্টার, সমাপনী বাংলা ব্রোশিওর, বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তা ও চা শ্রমিকদের রাজনৈতিক এজেন্ডা (বাংলা ও ইংরেজি), এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ। এই প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত এইসব প্রকাশনা এই প্রকল্পের দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে। ❑

অন দি মার্জিনস্

ইমেজেস্ অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস

"অন দি মার্জিনস্: ইমেজেস অব টি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এথনিক কমিউনিটিস" বাংলাদেশের চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতিকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোকচিত্রের একটি অ্যালবাম। অ্যালবামটি বাংলাদেশের অদৃশ্য এবং বিস্মৃত জাতিসত্তাগুলোর উপর একটি দুর্লভ দলিল। সিলেটের চা বাগান ঘুরিয়ে অ্যালবামটি আমাদের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলের সমতলে নিয়ে যায় এবং পৌঁছে দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে।

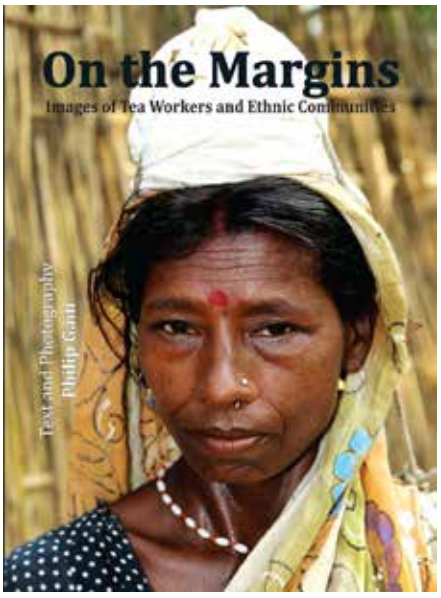

বলা যায়, এটি বাংলাদেশের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি রঙ্গিন ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনা।

অন দ্য মার্জিনস্ অ্যালবামটি বাংলাদেশের অদৃশ্য এবং বিলুপ্তপ্রায় জাতিসত্তাগুলোর পরিচয় উন্মোচন করে এবং তাদের দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের খানিকটা স্বাদ নেয়ার সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিকৃতি সংবলিত এই অ্যালবামটি জাতিসত্তাগুলোর বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের সাথে তাদের কঠোর কর্মক্ষেত্র ও অধিকার আদায়ের অবিরাম সংগ্রামের বিষয়গুলো মেলে ধরেছে।

যারা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর পরিচয় দৃষ্টিনন্দন ও সহজবোধ্য উপায়ে জানতে চায় তাদের জন্য এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা। এই অ্যালবামটি চা বাগানের ৮০টি এবং বাগানের বাইরে সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪৩টি জাতিসত্তার সুবিন্যস্ত তথ্য সংবলিত একটি তালিকা উপস্থাপন করেছে এবং তাদের পরিচয় উন্মোচন করেছে। নিঃসন্দেহে এই ফটো অ্যালবামটি পরম আন্তরিকতা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়।

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে বসবাসরত চা শ্রমিকদের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে বাংলাদেশে আগত পূর্ব-পুরুষদের প্রতিনিধিত্ব করে। বইটি এই স্থানসমূহের মনোরম সৌন্দর্য্য ছাপিয়ে এখানে বসবাসরত মানুষগুলোর উপর করা অবিরাম শোষণ ও প্রান্তিকতার বিষয়টি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

বইটির মূল বক্তব্য স্পষ্ট—বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তাসমূহ এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তারা স্বীকৃতি, সম্মান ও সুরক্ষার দাবিদার। এইসব মানুষের দুর্দশা এবং নিপীড়নের কথা বিবেচনা করে তাদের কষ্ট লাঘবে তৎপর হওয়া জরুরি যাতে করে বাংলাদেশ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র হিসাবে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। ❑

মাটির মায়া

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী বিরোধ ও সংঘর্ষের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র (বাংলা ও ইংরেজি, ৩০ মিনিট)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: ফিলিপ গাইন

প্রযোজনা ও পরিবেশনা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে যখন রাজনীতি, ধর্ম এবং দারিদ্র্য যুক্ত হয় তখন তার ফলাফল হতে পারে ভয়াবহ। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রযোজিত ৩০ মিনিটের তথ্যচিত্র 'মাটির মায়া' এমনি এক কাহিনীচিত্র। এর মধ্যে আমরা দেখি উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। তথ্যচিত্রটি পরিচালনা করেছেন ফিলিপ গাইন।

তথ্যচিত্রটি রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও গাইবান্ধা জেলার পাঁচটি ভূমি হারাবার কাহিনী এবং সেই সাথে ন্যায়বিচারের আকুতি আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। প্রতিটি ঘটনায় উঠে এসেছে খুন হবার ভয়, লুণ্ঠণ এবং ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা। বার্তা মূলত একটিই–এই বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভূমি অধিকার রক্ষায় অবিলম্বে ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

তথ্যচিত্রটি শুরু হয় রাজশাহী জেলার পাচন্দর গ্রামের মাহলে নারী সিসিলিয়া হাঁসদাকে দিয়ে। স্থানীয় পুলিশবাহিনীর সহায়তায় আদালতের উচ্ছেদ ডিক্রি হাতে ভূমিদস্যুরা মাহলেদের ঘরগুলো ভেঙে মাটির সাথে গুড়িয়ে দিয়েছে। সিসিলিয়া হাঁসদার মর্মস্পর্শী বর্ণনা উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর বিপন্নতার চিত্র তুলে ধরে।

পরবর্তী ঘটনায় আমরা দেখতে পাই দিনাজপুরের কচুয়া গ্রামের সান্তাল যুবক রবি সরেনকে, যার পিতা ও পিতামহ ভূমিদস্যুদের হাতে প্রাণ হারালেও সুবিচার পায়নি তার পরিবার। বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা যেমন জটিল তেমন আইনের অপপ্রয়োগ আদিবাসীদের ভূমি বিরোধকে করে তোলে আরো জটিল। রবি সরেন ও তার পরিবারের কাহিনী সহিংসতা, দারিদ্র্য এবং ভীতির এমন এক দুষ্টচক্রের প্রতিফলন যা বংশপরম্পরায় আদিবাসীদের হতবিহ্বল করে তোলে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওরাওঁ নারী বিচিত্রা তিরকি মৃত স্বামীর বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রমাগত যে আতংক এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যান তারই বর্ণনা তুলে ধরা হয় পরবর্তী ঘটনায়।

দিনাজপুরের চিরাকুটা গ্রামে সান্তাল ও বাঙালিদের মধ্যকার ভূমি বিরোধ দুই পক্ষেরই রক্তক্ষয় এবং গভীর বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তথ্যচিত্রে আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্যই পাই যেখানে তারা তাদের অভিযোগ ও বেদনার কথা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে মানুষের ভূমির প্রতি যে গভীর মায়া আর তার বিনিময়ে জীবন দিয়ে যে মূল্য পরিশোধ করতে হয়, তথ্যচিত্রের ঘটনাগুলোতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসীদের দেখা যায় "সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটি"-র ব্যানারে আন্দোলনে নেমেছে। যে ভূমির জন্য আজ তারা আন্দোলনে নেমেছে ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার রংপুর চিনিকল (বর্তমানে বন্ধ) নির্মাণের জন্য সে ভূমি অধিগ্রহণ করে।

তথ্যচিত্রটি বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর চিত্র দিলেও মূলভাব একটাই। আইনি নিরাপত্তার অভাব এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা ক্ষুদ্র এসব জাতিগোষ্ঠীকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় এবং দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতার চক্রে বেঁধে ফেলে। এতে এই জাতিসত্তাগুলো আর্থ-সামাজিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

'মাটির মায়া' একটি মর্মস্পর্শী তথ্যচিত্র। এর পরিসমাপ্তিটি বিষয়বস্তুর মতোই অমীমাংসীত থেকে গেছে। চরিত্রগুলোর সর্বশেষ পরিণতিও অজানা। এই কাহিনীগুলোর যেন কোনো শুভ সমাপ্তি নেই। ❑